শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের ভাবাদর্শ ও শিবানন্দবাণী

প্রব্রাজিকা অতন্দ্রপ্রাণা

স্বামী শিবানন্দজী মহারাজ একটি সুন্দর দৃশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে ভাবস্থ হয়ে পড়তেন; বলতেন, ''[স্বামী বিবেকানন্দ কৃত শ্রীরামকৃষ্ণের আরাত্রিক ভজনগীতি] 'খণ্ডন ভববন্ধন' যখনই হয়, তখনই আমি দেখতে পাই শ্রীরামকৃষ্ণ দাঁড়িয়ে আছেন আর তাঁকে ঘিরে মৃদঙ্গ বাজিয়ে পার্ষদ মহারাজরা সবাই গান করছেন। চারদিকে এক আনন্দলহরী।'' গভীর ভাবব্যঞ্জক এই কথাগুলি স্মরণে এলে মনে পড়ে, একবার শ্রীচক্র ইত্যাদি যন্ত্র ও বৌদ্ধদের 'মণ্ডলে'র মর্মার্থ বলতে গিয়ে এক প্রবীণ সন্ন্যাসী আমাদের সুন্দর একটি কথা বলেছিলেন : ''ঠাকুর আর মাকে মাঝখানে রেখে তোমরা একটি মণ্ডল চিন্তা করবে; আরও ভাববে তাঁদের চারপাশে অন্তরঙ্গ পার্ষদরা বসে আছেন। এটি একটি আধ্যাত্মিক শক্তিকেন্দ্র হল। এটিকে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের গোমুখ বা প্রাণকেন্দ্র বলে চিন্তা করবে।''

সঙ্ঘপ্রতিষ্ঠার দিনই স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীশ্রীমা সারদা দেবীকে সঙ্ঘজননীরূপে ঘোষণা করেছিলেন। তিনি মায়ের প্রসঙ্গে লিখেছেন, ''মায়ের কথা মনে পড়লে সময় সময় বলি, কো রামঃ?'' স্বামী অভেদানন্দজী মায়ের মহিমা বর্ণনা করে লিখেছেন, ''স্নেহেন বধ্নাসি মনোঽস্মদীয়ং/ দোষানশেষান্ সগুণীকরোষি।/ অহেতুনা নো দয়সে সদোষান/ স্বাঙ্কে গৃহীত্বা যদিদং বিচিত্রম্।'' —''[মা, তুমি] যে স্নেহ দিয়ে আমাদের মন আবদ্ধ কর, আমাদের অশেষ দোষকে গুণময় কর এবং দোষযুক্ত আমাদের নিজের কোলে গ্রহণ করে বিনা কারণে দয়া কর—এ অতি আশ্চর্য।'' শ্রীশ্রীমা তাঁর অপার স্নেহ ও ভালবাসা দিয়ে সঙ্ঘকে বেঁধে রেখেছেন। তাই ভালবাসার বন্ধনে এই সঙ্ঘের সকলে পরস্পরের সঙ্গে আবদ্ধ।

শ্রীশংকরাচার্য যখন সন্ন্যাসী সম্প্রদায় প্রবর্তন করে সারা ভারতবর্ষে অদ্বৈতবেদান্ত প্রচার করলেন তখনও তিনি কেন্দ্রবিন্দুতে স্থাপন করেছিলেন ত্রিপুরসুন্দরী শ্রীললিতা দেবীকে। ভাবটি এই, মায়ের কাছেই ব্রহ্মবিদ্যার চাবিকাঠি। এযুগে শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীশ্রীমাকে ত্রিপুরসুন্দরীরূপে ষোড়শীপূজা করলেন। সঙ্ঘের কল্পনা তখনও সকলের সুদূরপরাহত হলেও শ্রীরামকৃষ্ণ যেন তখনই সঙ্ঘের কেন্দ্রবিন্দুতে মাকে স্থাপন করে তাঁর ওপর সঙ্ঘের সব দায়িত্ব দিলেন।

সঙ্ঘ নির্মাণের উদ্দেশ্য

স্বামীজী দেখেছিলেন ভারতবর্ষে সাধুরা পাহাড়ে জঙ্গলে তপস্যা করে জীবন কাটিয়ে দিচ্ছেন। উদ্দেশ্য তাঁদের একটিই—নিজের মুক্তি। অপর দিকে ছুঁৎমার্গী, অনুন্নত অসহায় ভারতবর্ষ অশিক্ষা-কুশিক্ষায় জর্জরিত। অতীত গৌরবোজ্জ্বল ভারতবর্ষের বর্তমান করুণ অবস্থা দেখে স্বামীজীর প্রাণ কেঁদে উঠল। কীভাবে ভারতের কল্যাণ সম্ভব—এই হয়ে উঠল তাঁর একমাত্র ধ্যানজ্ঞান। শ্রীরামকৃষ্ণ জগন্মাতার যে-শক্তিকে জগতের কল্যাণে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন, সেই শক্তিকে কাজে লাগাতে চাইলেন তিনি। তাই শ্রীরামকৃষ্ণের মহাসমাধির পর তাঁর ত্যাগী পার্ষদরা প্রায় প্রত্যেকেই যখন সাধন-ভজনের জন্য যাঁর যেদিকে ইচ্ছে বেরিয়ে পড়েছিলেন, তখন স্বামীজী আনুষ্ঠানিকভাবে সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করে তাঁদের সকলকে একত্রিত করে শিবজ্ঞানে জীবসেবারূপ কর্মে নিযুক্ত করলেন এবং সঙ্ঘের কেন্দ্রে মাকে প্রতিষ্ঠা করলেন।

এ প্রসঙ্গে স্বামী শিবানন্দজী মহারাজ বলেছেন, ‘‘... আমরা নিজেদের আদর্শ অনুযায়ী কাজ করে যাচ্ছি। আর ঐ আদর্শ রেখে গেছেন সেই দূরদর্শী ঋষি স্বামীজী নিজে। খালি ভারতের নয়, সমগ্র জগতের সহস্র বৎসরের ভবিষ্যৎ ছবি ফুটে উঠেছিল তাঁর দিব্যদৃষ্টির সামনে, এবং তিনি সব স্পষ্ট দেখে, জেনে শুনে তবে একটা ধারা নির্ণয় করে গেছেন।... তিনি সুদূর ভবিষ্যতের দৃশ্য সব পরিষ্কার দেখতে পেতেন। আর এযুগে শ্রীরামকৃষ্ণরূপে যে ভগবৎশক্তির আবির্ভাব হয়েছে, তেমনটি শত শত বৎসরের মধ্যে আর হয়নি। এই আধ্যাত্মিক তরঙ্গ দীর্ঘকাল অবাধে সমগ্র জগতে চলবে। এই তো সবে সূচনা, সবে আরম্ভ। যে আধ্যাত্মিক সূর্য ভারতগগনে উদিত হয়েছে তার বিমল কিরণে সমগ্র জগৎ উদ্ভাসিত হবে। তাই তো স্বামীজী বলেছেন, ‘এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ।’ ভারতকে কেন্দ্র করেই সেই আধ্যাত্মিক শক্তির বিকাশ হবে। ঐ ঐশী শক্তির গতি রোধ করে কার সাধ্য। ভারতের জাগরণ অতি নিশ্চিত। শিক্ষা, দীক্ষা, শক্তি, সামর্থ্য, বিদ্যা, বুদ্ধি—সব বিষয়ে ভারতের এত উন্নতি হবে যে সমগ্র জগৎ দেখে অবাক হয়ে যাবে। ভারতের ভবিষ্যৎ এত মহিমান্বিত হবে যে তা অতীতের গৌরবকে ম্লান করে দেবে। তখন বুঝবে যে ঠাকুর-স্বামীজী কেন এসেছিলেন, এবং ভারতের জন্য তাঁরা কি করে গেছেন। ক্ষুদ্রবুদ্ধি মানব তাঁদের কার্যকলাপ কি বুঝবে? তাঁরা যে ভারতের জাতীয় কুণ্ডলিনী-শক্তিকে জাগ্রত করে দিয়ে গেছেন...।’’

‘‘যখন শ্রীভগবান নরদেহ ধারণ করে আসেন তিনি কোন দেশবিশেষের বা জাতিবিশেষের জন্য আসেন না, তিনি আসেন সমগ্র জগতের কল্যাণের জন্য। ভগবানের মহাসাত্ত্বিক ভাবের বিকাশ এবার। শ্রীরামকৃষ্ণ অবতার সত্ত্বগুণের পূর্ণ বিগ্রহ। তাঁর ভিতরে ষড়ৈশ্বর্য থাকা সত্ত্বেও এবার শুদ্ধ সাত্ত্বিকভাব আশ্রয় করেই তিনি নরদেহে ছিলেন।... স্বামীজীর মতো অমন মহাশক্তিশালী আধারকে তিনি সঙ্গে করে এনেছিলেন তাঁর সেই সাত্ত্বিক আধ্যাত্মিক ভাবপ্রচারের সহায়করূপে। স্বামীজী কি ইচ্ছা করলে এ দেশে একটা মহা রাজনীতিক বিপ্লবের সৃষ্টি করতে পারতেন না?... কিন্তু তিনি তা করেননি। ভারতের যদি বাস্তব কল্যাণ তাতে কিছু হতো তবে তিনি অবশ্যই তা করতেন।... আমাদের ভিতরই প্রভুর কৃপায় এমন শক্তি রয়েছে যে আমরাও ইচ্ছা করলে দেশটাকে তোলপাড় করে দিতে পারি। কিন্তু ঠাকুর তো আমাদের তা করতে দেবেন না। তিনি আমাদের এনেছেন তাঁরই কাজের সহায়করূপে এবং আমাদের হাত ধরে দেশের ও দশের যাতে বাস্তব

কল্যাণ হয় তাই করিয়ে নিচ্ছেন। আর আমরা করেও যাচ্ছি তাই। জগতের কল্যাণ-কামনা ছাড়া আমাদের তো আর কোন কামনা নেই! জগতের দুঃখকষ্টে আমাদের প্রাণ যে কতটা কাঁদে তা তো... বলে বোঝাবার নয়! সে জানেন একমাত্র অন্তর্যামী। ঠাকুর নরলীলা-সংবরণের পর তাঁর সমগ্র শক্তি ও কার্যভার অর্পণ করেছিলেন স্বামীজীর উপর। স্বামীজীও সারা দুনিয়াটা এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরে তন্ন তন্ন করে দেখে ঠাকুরের নির্দেশানুসারে সমগ্র জগতের, বিশেষত ভারতের কল্যাণকর কাজ করবার জন্যই এই মঠ-মিশন স্থাপন করলেন, এবং আমাদের সকলকেও একে একে এই সব কাজে লাগালেন।"

সঙ্ঘশরীরে শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীরামকৃষ্ণ এই সঙ্ঘশরীরে বর্তমান। সন্ন্যাসী-গৃহী যাঁরাই তাঁর ভাবাদর্শ অবলম্বন করে জীবন যাপন করে সঙ্ঘকে অগ্রসর করতে সাহায্য করেছেন, করছেন বা করবেন তাঁরা সকলেই রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘশরীরের অন্তর্ভুক্ত। মহাপুরুষ মহারাজের কথায় : ''ঠাকুর যে আধ্যাত্মিক শক্তি নিয়ে জগতে এসেছিলেন এবং যে শক্তিকে তিনি উদ্বুদ্ধ করে গেলেন, সেই ঐশী শক্তিকে অব্যাহত রাখবার জন্যই তো ঠাকুরের ইঙ্গিতে স্বামীজী এ ধর্মসঙ্ঘের গঠন করে গেলেন এবং এই মঠকে প্রধান কেন্দ্র করে ঐ কাজের সূচনা করেছেন। এই মঠই হলো আধ্যাত্মিক শক্তির power-house; এখান থেকেই আধ্যাত্মিক শক্তির স্রোত বয়ে গিয়ে সমগ্র জগৎকে প্লাবিত করবে।... ঠাকুর স্বামীজীকে বলেছিলেন—'তুই মাথায় করে নিয়ে আমায় যেখানে বসাবি আমি সেখানেই থাকব।' [তাই তো]...যেদিন মঠ প্রতিষ্ঠা হলো সেদিন স্বামীজী 'আত্মারাম'কে নিজে মাথায় করে নিয়ে এলেন এবং এ মঠে স্থাপন করলেন।" ''স্বামীজী নিজে ঠাকুরের নির্দেশ মতো এই সঙ্ঘ সংগঠন করেছেন; আর তাঁর উদার ধর্মভাব সমগ্র জগতে প্রচারের বিরাট দায়িত্ব এ-সঙ্ঘের উপর ন্যস্ত করে গেছেন। কেউ এই সঙ্ঘের অনিষ্ট করতে পারবে না, নিশ্চিত জেনো। যদি কেউ কখনও অন্যরকম মতলব নিয়েও আসে, তা হলে ঠাকুর তাদের মনের গতি ফিরিয়ে দেবেন, সকলকে তিনি বুঝিয়ে দেবেন—এমনকি নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে ফেলেও।... তিনি সকলকেই কৃপা করেন। পাপী, তাপী কেউ তাঁর কৃপা হতে বঞ্চিত হয় না।... তিনি সকলকেই ক্ষমা করেন। আচণ্ডালে কৃপা করার জন্যই তো তিনি রামকৃষ্ণরূপ ধারণ করে এসেছিলেন।"

রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের ঐশীপ্রবাহ

রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের মূল মন্ত্র 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ'। মহাপুরুষ মহারাজ বলেছেন, ''ঠাকুরের ভাব বলতে এককথায় বুঝায়—ভগবানলাভই জীবনের উদ্দেশ্য; আর ত্যাগ, তপস্যা, ও সর্বধর্মসমন্বয়ই প্রকৃত জীবন। তাঁর আগমনে ভগবানলাভের পথ অতি সুগম হয়ে গেছে। আর যে আধ্যাত্মিক স্রোত এসেছে তা বহু বৎসর চলবে—কোন সন্দেহ নেই।... এ যুগপ্রবাহ আপন শক্তিতে চলবে—কারো সাহায্যের অপেক্ষা করবে না।... এ যুগপ্রয়োজন-সাধনে যে সহায়ক হবে সে নিজে ধন্য হয়ে যাবে।" ''ইচ্ছা করলে আমরা সমাধিস্থ হয়ে থাকতে পারতাম। স্বাধ্যায় ধ্যান-তপস্যায় কাটাবার মতলব করেছিলাম।... স্বামীজীও ধ্যান-জপ ও তপস্যাদিতে জীবন কাটিয়ে দেবার মতলব করছিলেন; কিন্তু যে মহাশক্তি রামকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন তিনি তাঁকে তা করতে দিলেন না—জগতের উদ্ধারের জন্য যুগধর্মপ্রচাররূপ কার্যে নিয়োজিত করলেন। তিনি তো যোগীরাজ, ইচ্ছা করলেই সমাধিস্থ হয়ে বসে

থাকতে পারতেন; কিন্তু ঠাকুর তাঁকে তীব্র কর্মের ভিতর টেনে আনলেন। তোমাদের সকলকেও তিনি তাঁর যুগধর্মপ্রতিষ্ঠার সহায়রূপে নিয়োজিত করেছেন। যাকে তিনি ডেকেছেন সেই ধন্য।"

সঙ্ঘশক্তি

মহাপুরুষ মহারাজ সঙ্ঘপ্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের কথা স্মরণ করে বলেছেন, ''স্বামীজী বলতেন—'জানিস, এবার ব্রহ্মকুণ্ডলিনী স্বয়ং জাগ্রতা হয়েছেন। যাঁর ইচ্ছায় সৃষ্টি, স্থিতি, লয় সব হচ্ছে, সেই মহামায়া মহাকুণ্ডলিনীই এবার জেগেছেন ঠাকুরের আহ্বানে। Individual কুণ্ডলিনী তো জাগ্রতা হবেই, তাতে আর আশ্চর্য কি?' তাইতো সমগ্র জগতে এক মহাজাগরণের সাড়া পড়ে গেছে। আর সেই আদ্যাশক্তিই জগতের কল্যাণের জন্য ঠাকুরের দেহ আশ্রয় করে লীলা করছেন।"

আমরা সেই মহাশক্তি-সমুদ্রের বুদবুদ। সকলেই সেই একই শক্তি থেকে উদ্ভূত। এই উৎস থেকেই আমরা শক্তি পাব; যদি না আমাদের দিক থেকে কোনও বাধা থাকে। এই শক্তি ধারণ করার সব থেকে বড় বাধা আমাদের অহংকার। এই অহংকারকে নাশ করে ইচ্ছাশক্তি বৃদ্ধি করতে পারলে আমরা সঙ্ঘের যন্ত্রস্বরূপ হতে পারি। তাহলেই তাঁর কৃপা আমরা সঠিকভাবে অনুভব করতে পারব। তাঁর কৃপা সকলের ওপরেই সমানভাবে বর্ষিত হয়। শুধু আমাদের নিজের অহং, স্বার্থপরতা—এসব ভুলে পাল তুলে দিতে হবে। সঙ্ঘশক্তি সম্বন্ধে মহারাজের বাণী : ''ঠাকুর এক-একটা নাড়াচাড়া দিয়ে তাঁর সঙ্ঘশক্তিতে উদ্বুদ্ধ করে দিচ্ছেন, আর দেখিয়ে দিচ্ছেন যে, তাঁর কাজ একা কোন ব্যক্তিবিশেষের দ্বারা হবার নয়—এই সমস্ত সাধুমণ্ডলী একত্রিত হয়ে কাজ করবে এবং তখনই সব সুনিয়ন্ত্রিত হবে। আর যত ঝড়-ঝাপটা, বাধা-বিপত্তি আসবে ততই জেগে উঠবে ঠাকুরের সঙ্ঘশক্তি। 'শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি', যত বাধা-বিপত্তি আসবে ততই বেড়ে যাবে ঠাকুরের উপর... ভক্তি-বিশ্বাস ও নির্ভরতা। তাঁর যুগধর্ম-প্রবর্তনের জন্যই এই সঙ্ঘের সৃষ্টি এবং তিনি এই সঙ্ঘের প্রতি অঙ্গের ভিতর দিয়ে কাজ করছেন। আর এই যুগপ্রবর্তনের কাজ বহু শতাব্দী ধরে অবাধে চলবে—কেউ এর গতি রোধ করতে পারবে না। এ... ত্রিকালজ্ঞ ঋষি স্বয়ং স্বামীজীর কথা।"

''তিনি যাকে কৃপা করে তাঁর কাজের যন্ত্ররূপে বেছে নিয়ে যতটুকু কাজ সঙ্ঘে রেখে করিয়ে নেবেন, সে-ই ধন্য। তিনি স্বয়ং ভগবান, যুগাবতার হয়ে এসেছেন যুগধর্ম-সংস্থাপনের জন্য। অতএব তাঁর কাজের সহায়ক হওয়া কি কম সৌভাগ্যের কথা।" মহারাজ অনুভব করেছেন, ''তাঁর বিশাল শক্তির খেলা যত দিন যাবে ততই লোকে দেখতে পাবে। ধর্মজগতে একটা মহা ওলটপালট হয়ে যাবে।"

সঙ্ঘে সকলের একতানতা

স্বামীজী সঙ্ঘের প্রতিটি সদস্যকে বলেছেন নিজের will-power বা ইচ্ছাশক্তিকে সংযত করতে। সঙ্ঘের আদর্শের সঙ্গে একতানতা আনতে হবে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও আজ্ঞাবহতা দিয়ে। তবেই আমরা সঙ্ঘের সেবা যথাযথভাবে করতে পারব। মহাপুরুষ মহারাজ এ-প্রসঙ্গে বলেছেন, ''প্রভুর সঙ্ঘের এই যে পরস্পরের প্রতি প্রীতি, ভালবাসা ও শ্রদ্ধা—এই হল সঙ্ঘের জীবনীশক্তি। যতদিন পরস্পরের প্রতি এই নিঃস্বার্থ প্রেমের সম্বন্ধ বিদ্যমান থাকবে, ততদিন সঙ্ঘের একতা ও আধ্যাত্মিক শক্তি অক্ষুণ্ণ থাকবে।... আমাদের শরীর গেলেও তোমাদের সঙ্গে যে সম্বন্ধ তা কখনো যাবে না।"

''স্বামীজী দূরদ্রষ্টা ঋষি। তিনি ভবিষ্যতে কি

হবে না হবে সব জানতে পারতেন। তাই এসব নিয়ম করে গিয়েছেন মঠের জন্য। তাঁর কথা আমরা যত আলোচনা করব, যত পালন করব, ততই আমাদের কল্যাণ হবে।... ভগবানলাভই আমাদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য।... তিনি তো যুগাবতার, যুগধর্মসংস্থাপনের জন্যই এই রামকৃষ্ণরূপ ধরে এসেছেন। আমাদেরও তিনি কৃপা করবেন—করছেনও। নইলে এখানে আনবেন কেন? 'জৃম্ভিত-যুগ-ঈশ্বর জগদীশ্বর যোগসহায়'—এ স্বামীজীর কথা...। তিনি যুগ-ঈশ্বর। এ যুগে যে-কেউ তাঁর শরণাগত হবে তার কল্যাণ হবেই। শরণাগতি, আর প্রার্থনা... 'ঠাকুর, আমাদের ত্যাগ-বৈরাগ্য বাড়িয়ে দাও। আমাদের পবিত্র কর, পরস্পরের মধ্যে প্রীতি-ভালবাসা বাড়িয়ে দাও। তুমি হাত ধরে থাক।'... পরনিন্দা, পরচর্চা, এসব খুব খারাপ। ওতে মনের গতি নিচু হয়ে যায়। যতক্ষণ পারা গেল ভগবানের ধ্যান-জপ, পুজো-পাঠাদি করা গেল, বাকি সময় চুপচাপ থেকে স্মরণ-মনন করা খুব ভাল। সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে থাকার আবশ্যকতা ও উপকারিতা খুবই আছে। তাই তো স্বামীজী এ সঙ্ঘের সৃষ্টি করে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে সেবাদি শুদ্ধ কর্মেরও প্রবর্তন করে গেছেন।"

সঙ্ঘের উপকারিতা

সঙ্ঘে সকলের একই উদ্দেশ্য—ভগবানলাভ। ঠাকুরের কাজের জন্য দেহমনপ্রাণ সব দিয়ে সঙ্ঘরূপী শ্রীরামকৃষ্ণের সেবা করার সুযোগ সঙ্ঘ আমাদের দেয়। তাঁর কাজের জন্য সব সহ্য করে, খুব ত্যাগস্বীকার করে যেতে পারলেই অশেষ কল্যাণ সাধিত হবে। সঙ্ঘে থেকে আমাদের সহ্যগুণ যেমন বাড়ে, তেমনই খুব সহজেই আমরা যেকোনও ত্যাগ স্বীকার করতেও শিখি। সঙ্ঘবদ্ধ জীবনে আমরা অনেক বেশি শক্তিশালী। এ-প্রসঙ্গে মহাপুরুষ মহারাজের মূল্যবান উপদেশ : ''পাঁচটা হাঁড়ি এক জায়গায় নাড়াচাড়া করলে একটু ঠোকাঠুকি হয়।... এমন হয়ও আবার চলেও যায়। ... পাঁচজন একজায়গায় মিলে মিশে যদি না থাক তবে তাঁর কাজ হবে কি করে? তাঁর দিকে চেয়ে সব সয়ে যাবে—ভালমন্দ যে যা বলুক। তোমরা... ভাল হবার জন্য, সৎ হবার জন্য এখানে এসেছ। তোমাদের জীবনে আর অন্য কোন বাসনা নেই, কামনা নেই। তোমরা কেবল তাঁকেই চাও। তবে কাজকর্মে থাকতে গেলে সাময়িক একটু-আধটু মনোমালিন্য হয়েই থাকে। সে হওয়াটা কিছু বিচিত্র নয়, খুব স্বাভাবিক। তবে ওসব তোমাদের ভিতরে স্থায়ী নয়। আসে আবার চলে যায়; কারণ তোমাদের জীবনের লক্ষ্য হলো ভগবানলাভ। তোমাদের মধ্যে এসব ক্ষুদ্র রাগদ্বেষাদি আসতেই পারে না।... এই যে সব কাজকর্ম করছ, সবই সেবাজ্ঞানে করছ... এতে তোমাদের মন শুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে দিন দিন। এতে তোমাদের স্বার্থবুদ্ধি মোটেই নেই। তবে কি জান, কাজকর্মের সঙ্গে সঙ্গে নিয়মিত সাধন-ভজনও করতে হয়। যখনই সময় পাবে, বসে জপ করবে, তাঁর ধ্যান করবে, আর প্রাণভরে প্রার্থনা করবে। যখনই মনে কোন রকমের দুর্বলতা বা অভাববোধ আসবে, তখনই ঠাকুরকে জানাবে। খুব ব্যাকুলভাবে ডাকলেই তাঁর সাড়া পাওয়া যায়। তাঁর নাম খুব করবে। নামে দেহ মন শুদ্ধ হয়, মনের ময়লা ধুয়ে যায়। তোমরা সাধু হবার জন্য সব ছেড়েছুড়ে এসেছ; ভগবানলাভই... তোমাদের জীবনের উদ্দেশ্য। তোমাদের আদর্শ হলো 'তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ'—নিন্দা-স্তুতিতে সমভাব, নীরব থাকা, এবং যা জোটে তাতেই সন্তুষ্ট হওয়া—এই অবস্থা। তোমরা তাঁর ভাবে থাকবে।"

সঙ্ঘে থাকার ফলে আমাদের অজ্ঞাতসারেই চারটি যোগের সমন্বয় হয়ে যায় জীবনে। তাছাড়া সঙ্ঘে থাকতে গেলে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে আমাদের

পড়তেই হয়। তখনই আমরা আমাদের পরীক্ষা নিজেরাই করে নিতে পারি, অথবা আমাদের মনের উন্নতি হচ্ছে কী না বুঝতে পারি।

সঙ্ঘের দায়িত্ব

মহাপুরুষ মহারাজ সঙ্ঘের দায়িত্ব সম্বন্ধে আমাদের সচেতন করে দিয়েছেন। ''যারা ঠাকুরের এই সঙ্ঘে স্থান পেয়েছে, তাদের প্রত্যেকের উপর স্বামীজী ন্যস্ত করে গেছেন বিরাট দায়িত্ব। প্রত্যেক সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীকে ত্যাগ ও তপস্যাময় এমন আদর্শ জীবন গড়ে তুলতে হবে, যাতে প্রত্যেকের জীবন ঠাকুরের পবিত্র সাত্ত্বিক ভাব-প্রচারের উপযোগী যন্ত্রস্বরূপ হয়, যাতে সমগ্র জগৎ তাঁর পবিত্র সঙ্ঘকে দেখে—এমনকি তাঁর সঙ্ঘের প্রতি অঙ্গের ভেতর দিয়ে ঠাকুরকে বুঝতে পারে। স্বামীজী বলেছেন—'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ।' তা এ জগতের ঠিক ঠিক হিত তখনই হবে, যখন সমগ্র জগতে ঠাকুরের উদার সার্বভৌম ভাব প্রচারিত হবে। আর সে-কাজের ভার ন্যস্ত করে গেছেন তিনি সমগ্র সঙ্ঘের উপর।''

স্বামীজী চেয়েছিলেন, নারী ও জনগণের জাগরণ। শিবানন্দজী এ-প্রসঙ্গে বলেন, ''স্বামীজী বলেছিলেন যে, এবার শূদ্রশক্তির জাগরণ। তার লক্ষণও দেখা যাচ্ছে। সারা পৃথিবীর শ্রমিকদের ভেতর নবজাগরণের সূচনা হয়েছে; ভারতবর্ষও বাদ যাবে না। কোন বহিঃশক্তি এ অভ্যুত্থানকে রোধ করতে পারবে না; কারণ এর পেছনে রয়েছে ঐশী শক্তি—যুগাবতারের সাধনা। ঠাকুরের শক্তি কতভাবে কত দিকে খেলা করবে, তা একমাত্র জেনেছিলেন স্বামীজী; আর কেউ তা বুঝতে পারেনি। ঠাকুর দেহত্যাগের পূর্বে তাঁর সমস্ত আধ্যাত্মিক শক্তি স্বামীজীর ভেতর সংক্রামিত করে দিয়ে বলেছিলেন—'আজ তোকে সব দিয়ে ফতুর হলুম।' আর যুগধর্ম প্রচারের সমস্ত ভারও দিয়েছিলেন স্বামীজীর ওপর। স্বামীজীও সেই শক্তিতে শক্তিমান হয়ে জগতের হিতের জন্য কাজ করে গেছেন। যে ভাবধারা তিনি জগতে রেখে গেছেন, সে-সকল ভাব বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ভাবে নানা আধারের ভেতর দিয়ে ক্রমে ফলপ্রসূ হবে এবং সমগ্র জগতের সর্বাঙ্গসুন্দর উন্নতি-সাধনের কারণ হবে নিশ্চয়।''

মহাপুরুষ মহারাজ বলেছেন, ''ঠাকুরের অলৌকিক তপস্যায় 'ভূর্ভুবঃ স্বঃ'—ইত্যাদি লোকসমুদয় উপকৃত হবে।'' সঙ্ঘের মূলকেন্দ্র বেলুড় মঠে পুঞ্জীভূত মহাশক্তি সম্পর্কে তাঁর অত্যুচ্চ উক্তিগুলি আমাদের উদ্দীপ্ত করে। এমনকী অতি সাধারণ মানুষও এখানে এসে ধীরে ধীরে কল্যাণের পথে অগ্রসর হবে—একথা ব্যাখ্যা করে তিনি বলতেন, ''এখন দিনের পর দিন পৃথিবীর নানাস্থান থেকে সব শ্রেণীর স্ত্রী-পুরুষ, আবালবৃদ্ধবনিতা এ মহাকেন্দ্রে আকৃষ্ট হয়ে এসে এসব পূজাদি দেখে ও অনুষ্ঠান করে ধীরে ধীরে পবিত্র হবে ও শ্রীশ্রীঠাকুরের এই মহদুদার সমন্বয়ভাব গ্রহণ করে ধন্য হবে। সাধারণ অধিকারীর জন্য এসব বাহ্য পূজাদির বিশেষ প্রয়োজন আছে। তাই তো শ্রীশ্রীমা-ই প্রথমে শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজার প্রবর্তন করলেন। তারপর স্বামীজী প্রভৃতিও পূজাদি সব করে গিয়েছেন।''

রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের মাধ্যমেই শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাব ধীরে ধীরে ভারতবর্ষের জাগরণ ঘটিয়ে জগতে প্রসারিত হবে—এই সত্যের প্রতি মহাপুরুষ মহারাজ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন। ''জগতের কল্যাণ বিশেষত ভারতের কল্যাণের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের অবতরণ। এবার ভারতের জাগরণ নিশ্চিত।''—এই ছিল তাঁর আশ্বাসবাণী।

সহায়ক গ্রন্থ

সংকলক : স্বামী অপূর্বানন্দ, *শিবানন্দ বাণী* (উদ্বোধন কার্যালয়, ২০২১)